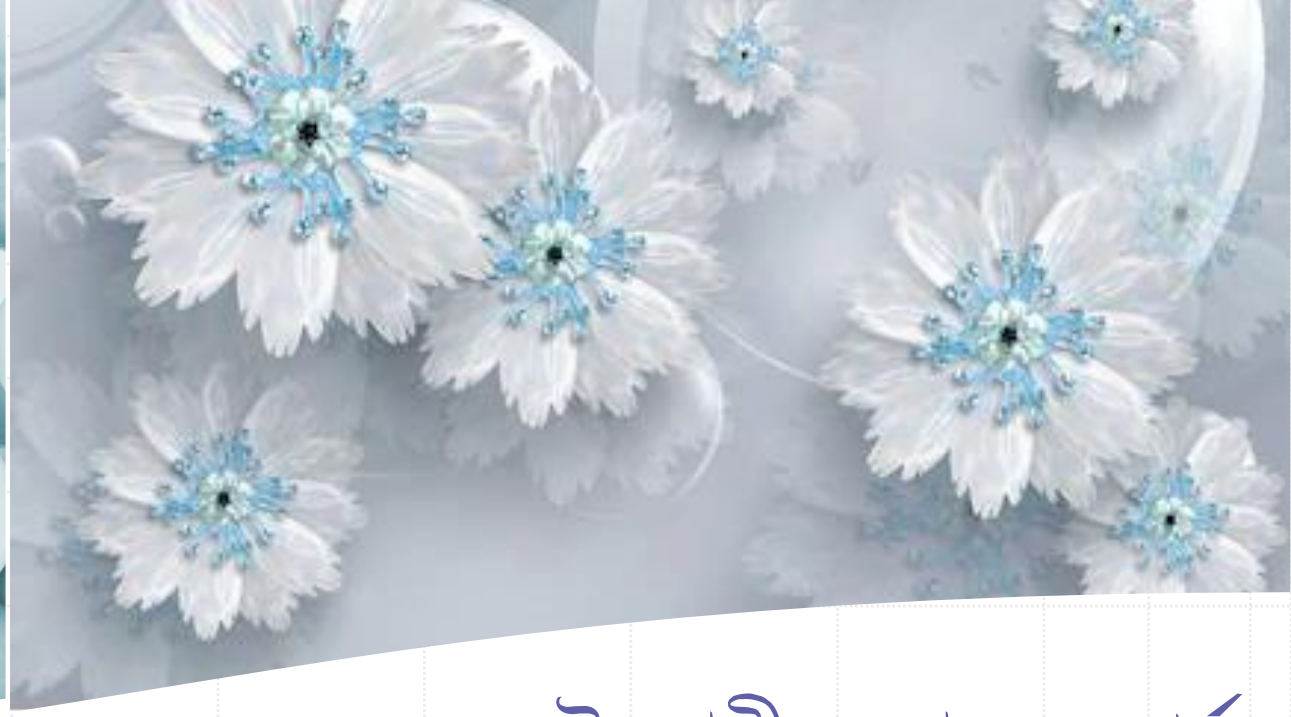

হযরত ইবরাহীম আ ২য় পর্ব

নবী কাহিনীঃ ৭ম

আসসালামু'আলাইকুম
ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

হে রব! আমরা কেবল তোমার উপরেই ভরসা করছি এবং তোমার দিকেই মুখ ফিরাচ্ছি ও তোমার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল’

(মুমতাহানাহঃ ৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের সময় ইবরাহীম (আঃ) বলে ওঠেন,
حَسْبُنَا اللهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতই না সুন্দর তত্ত্বাবধায়ক'। বুখারী, হা/৪৫৬৩ তাফসীর অধ্যায়, সূরা আলে-ইমরান ।
আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসও রয়েছে, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি কীভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারি যখন শিঙ্গার বাহক তার ঠোঁটে এটি রাখে এবং শ্রবণ করে। উহা ফুঁ দিবার নির্দেশ দাও, অতঃপর সে উহা ফুঁ দিবে। এটা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের উপর ভারী হয়ে উঠল, তখন তিনি তাদেরকে বললেনঃ "বলুন, হাসবুনাল্লাহু ওয়া নিয়াম আল-ওয়াকিল (আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কার্যনির্ধারক; আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। ইমাম তিরমিযী (নং ২৪৩১)
শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:
"হাসবুনা" অর্থ: তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট যা আমাদের উদ্বেগের বিষয় এবং যা আমাদের উপর ঘটে। "ওয়া নিয়াম আল-ওয়াকিল" অর্থ: তিনি মহিমান্বিত ও মহিমান্বিত হন, তিনিই সর্বোত্তম যিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট, কারণ তিনি একজন উত্তম অভিভাবক এবং একজন উত্তম সাহায্যকারী।
কিন্তু তিনি ঐ ব্যক্তির অভিভাবক ও সাহায্যকারী মাত্র, যে তাঁর কাছে আশ্রয় ও সাহায্য কামনা করে। তিনি, মহিমান্বিত ও মহিমান্বিত হোন, তিনি সর্বাধিক উদার এবং সর্বাধিক দয়ালু, সুতরাং যদি কেউ তার সমস্ত বিষয়ে তাঁর দিকে ফিরে আসে তবে তিনি তাকে সাহায্য করবেন, তাকে সমর্থন করবেন এবং তার যত্ন নেবেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আদম সন্তানকে নিয়ে, কারণ সে প্রায়ই আল্লাহর কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং যত বৈষয়িক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে তার উপর নির্ভর করে এবং আধ্যাত্মিক পদক্ষেপের প্রতি মনোযোগ দেয় না। (শরহে রিয়াদ আল-সালিহীন ১/৫৪২)।
এ দোয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যা ইচ্ছা নির্ধারণ করে দেবেন এবং তার জন্য যথেষ্ট করবেন, যাতে তার লোকের প্রয়োজন না হয়। কেননা এটা আল্লাহর প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি এবং মানুষের যা আছে তার কোন প্রয়োজন নেই বলে ঘোষণা দেয়। তাছাড়া এখানে লক্ষণীয় যে, এমন কোন হাদীস নেই যা দ্বারা বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি এ দোয়া করবে সে অমুক সওয়াব পাবে। কিন্তু যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহিমান্বিত ও মহিমান্বিত হন, সে আয়াতে বলা হয়েছেঃ
وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ؕ اِنَّ اللهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ؕ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْرًا
আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার ইচ্ছে পূরণ করবেনই; অবশ্যই আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন সুনির্দিষ্ট মাত্রা।[সূরা তালাক ৬৫:৩]

যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, সে যা নিয়ে চিন্তিত তার জন্য তিনি যথেষ্ট হবেন এবং তিনি তার হেফাজত করবেন, যাতে তাঁর পরে তার আর কারও প্রয়োজন হবে না। এইটুকুই যথেষ্ট পুণ্য ও প্রতিদান, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে বরকতময় হবেন আল্লাহর শক্তি, শক্তি ও প্রজ্ঞা দ্বারা। তাই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ

আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা আনফাল ৮:৪৯]।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ আমার উম্মত থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্ববেশ করবে। তাদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা আল্লাহর ওপর ভরসা করবে। [বুখারী: ৫৭০৫, মুসলিম: ২১৮, মুসনাদে আহমাদ: ১/৪০১]

আল-ওয়াকীল হলেন আল-হাফিজ (সংরক্ষণকারী), আল-মুহিত (যিনি সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন)। আর বলা হয়েছে যে, এর অর্থ আল-শহীদ (সাক্ষী)।

তিনিই রিজিকদাতা, যিনি তাঁর বান্দাদের রিজিকের নিশ্চয়তা দেন এবং তাদের স্বার্থ রক্ষা করেন। বাস্তবতা হলো, তিনি স্বাধীনভাবে সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন। সৃষ্টি ও হুকুমের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তাঁরই এবং অন্য কেউ এগুলির কিছুই ধারণ করে না। আর বলা হয়েছে যে, এর অর্থ আল-হাফেজ, যিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সবকিছুকে টিকিয়ে রাখার নিশ্চয়তা দেন।

বলা হয়েছিল যে, এর অর্থ আল-কাফিল (জামিনদার) এবং তিনিই আমাদের রিযিক প্রদানের জন্য সর্বোত্তম জামিনদার।

বলা হয়েছে যে, এর অর্থ আল-কাফে (যথেষ্ট), এবং তিনিই পর্যাপ্ত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ

"অতঃপর তারা বলল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। [সূরা আলে ইমরান ৩:১৭৩]

অর্থাৎ, তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আরবীতে আল-ওয়াকীল অর্থ ঐ ব্যক্তিকে যার উপর ন্যস্ত তার কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এ আয়াতে উল্লেখিত মুমিনগণ তাদের বিষয়াদি আল্লাহর উপর ন্যস্ত করেছেন এবং তাঁর উপর ভরসা করেছেন, তাই তিনি নিজেকে সেই আমানত পূর্ণ করেছেন এবং তারা তাঁর উপর ভরসা করেছেন বলে বর্ণনা করেছেন। যখন বান্দা তার পালনকর্তার উপর ভরসা করে, তখন সে তাঁর পালনকর্তার প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁরই সত্যিকারের বান্দায় পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ কর্তৃত্ব রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহর উপর যা ন্যস্ত করা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং তিনি এর যাবতীয় খুঁটিনাটি পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁর প্রজ্ঞা এবং সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতিতে কীভাবে এটি মোকাবেলা করা যায় সে সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান দ্বারা এটি মোকাবেলা করার এবং তাঁর উপর যা অর্পিত হয়েছে তা রক্ষা করার পূর্ণ ক্ষমতা তাঁর রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে কোন গুণাবলীর মধ্যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধ্বে; তিনিই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। এ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে এবং তিনি নিখুঁত প্রজ্ঞার সাথে সকল বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করার নিখুঁত ক্ষমতা রাখেন, কারণ তিনিই সর্বোত্তম বিষয়াদি নিষ্পত্তিকারী।

সূত্র: শাদ আসমা' আল্লাহ তায়ালা আল-হুসনা বাই ড. হিসাহ আল-সাগীর, পৃ.

ইবরাহীমের হিজরত-পূর্ব বিদায়ী ভাষণ

তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে এবং মূর্তিপূজারী ও তারকাপূজারী নেতাদের সাথে তর্কযুদ্ধে জয়ী হয়ে অবশেষে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে ইবরাহীমের দাওয়াত ও তার প্রভাব সকলের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। যদিও সমাজপতি ও শাসকদের অত্যাচারের ভয়ে প্রকাশ্যে কেউ ইসলাম কবুলের ঘোষণা দেয়নি। কিন্তু তাওহীদের দাওয়াত তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তা সাধারণ জনগণের হৃদয়ে আসন গেড়ে নিয়েছিল। অতএব এবার অন্যত্র দাওয়াতের পালা। ইবরাহীম (আঃ) সত্তরোর্ধ্ব বয়সে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হন। এই দীর্ঘ দিন দাওয়াত দেওয়ার পরেও নিজের স্ত্রী সারাহ ও ভাতিজা লূত ব্যতীত কেউ প্রকাশ্যে ঈমান আনেনি। ফলে পিতা ও সম্প্রদায় কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি আল্লাহর হুকুমে হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি নিজ সম্প্রদায়কে ডেকে যে বিদায়ী ভাষণ দেন, তার মধ্যে সকল যুগের তাওহীদবাদী গণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয় লুকিয়ে রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوْا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيْمَ لِأَبِيْهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ-

'তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, আমরা সম্পর্ক ছিন্ন করছি তোমাদের সাথে এবং তাদের সাথে যাদেরকে তোমরা পূজা কর আল্লাহকে বাদ দিয়ে। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিঘোষিত হ'ল যতদিন না তোমরা কেবলমাত্র এক আল্লাহর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করবে। ... প্রভু হে! আমরা কেবল তোমার উপরেই ভরসা করছি এবং তোমার দিকেই মুখ ফিরাচ্ছি ও তোমার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল' (মুমতাহানাহঃ ৪)।

এরপর তিনি কওমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ' إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِيْنِ، আমি চললাম আমার প্রভুর পানে, সত্বর তিনি আমাকে পথ দেখাবেন' (সাফফাতঃ ৯৯)। অতঃপর তিনি চললেন দিশাহীন যাত্রাপথে।

আল্লাহ বলেন, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِيْنَ،

'আর আমরা তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলাম সেই দেশে, যেখানে বিশ্বের জন্য কল্যাণ রেখেছি' (আম্বিয়া ২১/৭১)। এখানে তাঁর সাথী বিবি সারা-র কথা বলা হয়নি নারীর গোপনীয়তা রক্ষার শিষ্টাচারের প্রতি খেয়াল করে। আধুনিক নারীবাদীদের জন্য এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

ইবরাহীম ও লুতকে নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ (অর্থাৎ ইরাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌছতে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীদের জন্যে কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে। তার বরকত তথা সমৃদ্ধি বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় ধরনেরই। বস্তুগত দিক দিয়ে তা দুনিয়ার উর্বরতম এলাকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে দু'হাজার বছর থেকে তা থেকেছে আল্লাহর নবীগণের কর্মক্ষেত্র। দুনিয়ার কোন এলাকায় এতো বিপুল সংখ্যক নবী আবির্ভূত হয়নি।

মূলতঃ সিরিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। অভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটিতে অনেক নবী-রাসূলের সমারোহ ঘটেছিল। অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদ-নদী, প্রাচুর্য, ফল-মূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে। [দেখুন, কুরতুবী) বেশির ভাগ ব্যাখ্যাতাগণের নিকট এ থেকে শাম (বর্তমানে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন) দেশকে বুঝানো হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লূতকে পথ প্রদর্শন করে নিয়ে গেলেন পার্শ্ববর্তী দেশ শাম বা সিরিয়ার অন্তর্গত বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেনআন নামক স্থানে, যা এখন তাঁর নামানুসারে 'খালীল' لخليل নামে পরিচিত হয়েছে। ঐ সময় সেখানে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অস্তিত্ব ছিল না।

এখানেই ইবরাহীম (আঃ) বাকী জীবন অতিবাহিত করেন ও এখানেই কবরস্থ হন। এখানে হিজরতের সময় তাঁর বয়স ৮০ থেকে ৮৫-এর মধ্যে ছিল এবং বিবি সারা-র ৭০ থেকে ৭৫-এর মধ্যে। সঙ্গী ভাতিজা লূতকে আল্লাহ নবুঅত দান করেন ও তাকে পার্শ্ববর্তী সমৃদ্ধ নগরী সাদূমসহ পাঁচটি নগরীর লোকদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয় ও তিনি সেখানেই বসবাস করেন। ফলে ইবরাহীমের জীবনে নিঃসঙ্গতার এক কষ্টকর অধ্যায় শুরু হয়।

উল্লেখ্য যে, মানবজাতির প্রথম ফসল ডুমুর (তীন) বর্তমান ফিলিস্তীনেই উৎপন্ন হয়েছিল আজ থেকে এগারো হাযার বছর আগে। সম্প্রতি সেখানে প্রাপ্ত শুকনো ডুমুর পরীক্ষা করে এ তথ্য জানা গেছে। ঢাকা, দৈনিক ইনকিলাব তাং ৭/৬/০৬ পৃঃ ১৩।

ইসলামী আন্দোলনে দাওয়াত ও হিজরত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তৎকালীন পৃথিবীর সমৃদ্ধতম নগরী ছিল বাবেল, যা বর্তমানে 'বাগদাদ' নামে পরিচিত। কুরতুবী, আন'আম ৭৫-এর টীকা।

খাৎনা

ইবরাহীমের প্রতি আদেশ হ'ল খাৎনা করার জন্য। এসময় তাঁর বয়স ছিল অন্যূন ৮০ বছর। হুকুম পাওয়ার সাথে সাথে দেরী না করে নিজেই নিজের খাৎনার কাজ সম্পন্ন করলেন। বুখারী, আবু হুরায়রা হ'তে হা/৩৩৫৬, ৬২৯৭; কুরতুবী হা/৬৫১-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বিনা দ্বিধায় এই কঠিন ও বেদনাদায়ক কাজ সম্পন্ন করার মধ্যে আল্লাহর হুকুম দ্রুত পালন করার ও এ ব্যাপারে তাঁর কঠোর নিষ্ঠার প্রমাণ পাওয়া যায়। খাৎনার এই প্রথা ইবরাহীমের অনুসারী সকল ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে আজও চালু আছে। বস্ত্ততঃ খাৎনার মধ্যে যে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রয়েছে, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ তা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। এর ফলে খাৎনাকারীগণ অসংখ্য অজানা রোগ-ব্যাধি হ'তে মুক্ত রয়েছেন এবং সুস্থ জীবন লাভে ধন্য হয়েছেন। এটি মুসলিম এবং অমুসলিমের মধ্যে একটি স্থায়ী পার্থক্যও বটে।

একদা হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহকে বল্ল " হে আমার প্রভু! তুমি কিভাবে মৃতদের পুনর্জীবিত করো তা আমাকে দেখিয়ে দাও। জবাবে আল্লাহ বললেনঃ তুমি কি পুনর্জীবিত করাকে বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম আঃ জবাব দিলঃ হে আল্লাহ বিশ্বাস তো অবশ্যই করি, তবে দেখে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে চাই। তখন আল্লাহ বললেনঃ ঠিক আছে, তবে তুমি চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। পাখিগুলি ছিল একটি ময়ূর, একটি শকুন, একটি কাক ও একটি মোরগ (তাফসীরে জালালাইন)। তারপর সেগুলি জবেহ করে তাদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রাখে আসা এরপর এক স্থানে এসে তাদেরকে তাদের নামে ডাকো। দেখ তারা পুনর্জীবত হয়ে তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে।

তাফসীরে জালালাইন ও ইবনে কাসীরে বর্ণনা করেছেন হযরত ইব্রাহীম আঃ পাখিগুলি জবেহ করে খন্ড খন্ড করেন এবং সবগুলি খন্ড একত্রে মিশিয়ে নেন অতঃপর ঐ খন্ডগুলি ৪টি অথবা ৭টি পাহাড়ের উপর ভাগ, ভাগ করে রেখে দেন।

ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন- পাখির মাথাগুলি তিনি নিজের হাতে রাখেন।তারপর তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে এক স্থান থেকে পাখিগুলির নাম ধরে ডাকতে থাকেন। যখন যে পাখিটির নাম ধরে ডাকেন তখন ঐ পাখীর বিভিন্ন পাহাড়ে থাকা গোস্ত টুকরা ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পালকগুলি একত্রে মিলিত হয়ে ইব্রাহীম আঃ এর কাছে আসতে থাকে তখন তিনি নিজহাতের মাথাগুলি লাগিয়ে দিলে পরিপূর্ণ পাখিতে রূপ নিয়ে তা উড়ে যায়। তিনি এটিকে পরীক্ষা করার জন্য অন্য যে পাখির নাম ধরে ডাকেন সেই পাখির মাথা না দিয়ে অন্য পাখির মাথা দিলে তা সংযোগ হতো না বরং নির্দিষ্ট পাখির মাথা দিলেই কেবল তা যুক্ত হয়।এভাবেই হযরত ইব্রাহীম আঃ মহান আল্লাহর অশেষ কুদরতে নিজের চক্ষু দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন মৃতকে পুনর্জীবিত করার আল্লাহর তা'য়ালার অভিনব কৌশলটি।

সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় ২৬০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-
আর সেই ঘটনাটিও সামনে রাখো, যখন ইবরাহীম বলেছিলঃ "আমার প্রভু! আমাকে দেখিয়ে দাও কিভাবে তুমি মৃতদের পুনজীবিত করো। " বললেনঃ তুমি কি বিশ্বাস করো না? ইবরাহীম জবাব দিলঃ বিশ্বাস তো করি, তবে মানসিক নিশ্চিন্ততা লাভ করতে চাই। বললেনঃ ঠিক আছে, তুমি চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও। তারপর তাদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের ওপর রাখো৷ এরপর তাদেরকে ডাকো৷ তারা তোমার কাছে দৌড়ে চলে আসবে। ভালোভাবে জেনে রাখো, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময় ।

মিসর সফর

দুর্ভিক্ষ তাড়িত কেন'আন হ'তে অন্যান্যদের ন্যায় ইবরাহীম (আঃ) সস্ত্রীক মিসরে রওয়ানা হ'লেন। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাঁর জন্য এখানেই রূযী পাঠাতে পারতেন। কিন্তু না। তিনি মিসরে কষ্টকর সফরে রওয়ানা হ'লেন। সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল এক কঠিন ও মর্মান্তিক পরীক্ষা এবং সাথে সাথে একটি নগদ ও অমূল্য পুরষ্কার।

ঐ সময় মিসরের ফেরাঊন ছিল একজন নারী লোলুপ মদ্যপ শাসক। তার নিয়োজিত লোকেরা রাস্তার পথিকদের মধ্যে কোন সুন্দরী মহিলা পেলেই তাকে ধরে নিয়ে বাদশাহকে পৌঁছে দিত। যদিও বিবি 'সারা' ঐ সময় ছিলেন বৃদ্ধা মহিলা, তথাপি তিনি ছিলেন সৌন্দর্য্যের রাণী। মিসরীয় সম্রাটের নিয়ম ছিল এই যে, যে মহিলাকে তারা অপহরণ করত, তার সাথী পুরুষ লোকটি যদি স্বামী হ'ত, তাহ'লে তাকে হত্যা করে মহিলাকে নিয়ে যেত। আর যদি ভাই বা পিতা হ'ত, তাহ'লে তাকে ছেড়ে দিত। তারা ইবরাহীমকে জিজ্ঞেস করলে তিনি সারাকে তাঁর 'বোন' পরিচয় দিলেন। নিঃসন্দেহে 'সারা' তার ইসলামী বোন ছিলেন। ইবরাহীম তাকে আল্লাহর যিম্মায় ছেড়ে দিয়ে ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন ও আল্লাহর নিকটে স্বীয় স্ত্রীর ইয্যতের হেফাযতের জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করতে থাকলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর ইয্যতের হেফাযত করবেন।

সারাকে যথারীতি ফেরাঊনের কাছে আনা হ'ল। অতঃপর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

‘যখন সারা সম্রাটের নিকটে নীত হ’লেন এবং সম্রাট তার দিকে এগিয়ে এল, তখন তিনি ওযূ করার জন্য গেলেন ও ছালাতে রত হয়ে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! যদি তুমি জেনে থাক যে, আমি তোমার উপরে ও তোমার রাসূলের উপরে ঈমান এনেছি এবং আমি আমার একমাত্র স্বামীর জন্য সতীত্ব বজায় রেখেছি, তাহ’লে তুমি আমার উপরে এই কাফিরকে বিজয়ী করো না’।বুখারী হা/২২১৭ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়; আহমাদ, সনদ ছহীহ।

সতীসাধ্বী স্ত্রী সারার দো‘আ সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে গেল। সম্রাট এগিয়ে আসার উপক্রম করতেই হাত-পা অবশ হয়ে পড়ে গিয়ে গোঙাতে লাগলো। তখন সারাহ প্রার্থনা করে বললেন, হে আল্লাহ! লোকটি যদি এভাবে মারা যায়, তাহ’লে লোকেরা ভাববে আমি ওকে হত্যা করেছি’। তখন আল্লাহ সম্রাটকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু শয়তান আবার এগিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে আবার মরার মত পড়ে রইল।

এভাবে সে দুই অথবা তিনবার বেহুঁশ হয়ে পড়লো আর সারা-র দো‘আয় বাঁচলো। অবশেষে সে বলল, তোমরা আমার কাছে একটা শয়তানীকে পাঠিয়েছ। যাও একে ইবরাহীমের কাছে ফেরত দিয়ে আসো এবং এর খেদমতের জন্য হাজেরাকে দিয়ে দাও। অতঃপর সারাহ তার খাদেমা হাজেরাকে নিয়ে সসম্মানে স্বামী ইবরাহীমের কাছে ফিরে এলেন’(ঐ)। এই সময় ইবরাহীম ছালাতের মধ্যে সারার জন্য প্রার্থনায় রত ছিলেন। সারা ফিরে এলে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। আল-হামদুলিল্লাহ! যে আল্লাহ তাঁর বান্দা ইবরাহীমকে নমরূদের প্রজ্জ্বলিত হুতাশন থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন, সেই আল্লাহ ইবরাহীমের ঈমানদার স্ত্রীকে ফেরাঊনের লালসার আগুন থেকে কেন বাঁচিয়ে আনবেন না? অতএব সর্বাবস্থায় যাবতীয় প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য।

‘আবুল আম্বিয়া’ ((أبو الأنبياء)হিসাবে আল্লাহ পাক যেভাবে ইবরাহীমের পরীক্ষা নিয়েছেন, উম্মুল আম্বিয়া ((أم الأنبياء)হিসাবে তিনি তেমনি বিবি সারা-র পরীক্ষা নিলেন এবং উভয়ে পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হ’লেন। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

ধারণা করা চলে যে, ফেরাঊন কেবল হাজেরাকেই উপহার স্বরূপ দেয়নি। বরং অন্যান্য রাজকীয় উপঢৌকনাদিও দিয়েছিল। যাতে ইবরাহীমের মিসর গমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায় এবং বিপুল মাল-সামান ও উপঢৌকনাদি সহ তিনি কেন‘আনে ফিরে আসেন।

উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, বান্দা যখন নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপরে সোপর্দ করে দেয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই সকল কাজ করে, তখন আল্লাহ তার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে নেন। তার জান-মাল-ইয্যত সবকিছু তিনিই হেফাযত করেন। আলোচ্য ঘটনায় ইবরাহীম ও সারাহ ছিলেন একেবারেই অসহায়। তারা স্রেফ আল্লাহর উপরেই নির্ভর করেছেন, তাঁর কাছেই কেঁদেছেন, তাঁর কাছেই চেয়েছেন। ফলে আল্লাহ তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, বান্দার দায়িত্ব হ’ল, যেকোন মূল্যে হক-এর উপরে দৃঢ় থাকা ও অন্যকে হক-এর পথে দাওয়াত দেওয়া। ইবরাহীম দারিদ্রের তাড়নায় কাফেরের দেশ মিসরে গিয়েছিলেন। কিন্তু নিজেরা যেমন ‘হক’ থেকে বিচ্যুত হননি, তেমনি অন্যকে দাওয়াত দিতেও পিছপা হননি। ফলে আল্লাহ তাঁকে মর্মান্তিক বিপদের মধ্যে ফেলে মহা পুরষ্কারে ভূষিত করলেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইবরাহীম (আঃ) তিনবার ব্যতীত জীবনে আর কখনো মিথ্যা বলেননি। তার দু'টি ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। (১) তিনি তাদের কথার উত্তরে বলেছিলেন, আমি অসুস্থ। (২) তাঁর দ্বিতীয় কথাটি ছিল, বরং তাদের বড় মূর্তিটিই একাজ করেছে। (৩) আর একটি ছিল তাঁর নিজস্ব ব্যাপারে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, একদা ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী সারা মিসরের এক অত্যাচারী শাসকের এলাকায় পৌঁছেন। তখন শাসককে খবর দেয়া হল যে, এখানে একজন লোক এসেছে, তাঁর সাথে আছে একজন অতীব পরমা সুন্দরী নারী। রাজা তখন ইবরাহীমের কাছে লোক পাঠাল। সে তাকে জিজ্ঞেস করল যে, বাদশাহ জানতে চেয়েছেন, এ রমণী কে? ইবরাহীম (আঃ) বললেন, সে আমার বোন। অতঃপর তিনি সারার কাছে আসলেন এবং তাকে বললেন, হে সারা! তুমি আমাকে মিথ্যুক প্রমাণ কর না। আমি তাদেরকে বলেছি, তুমি আমার বোন। যদি এ অত্যাচারী শাসক জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী, তাহলে সে তোমাকে আমার নিকট হতে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবে। অতএব যদি সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তাহলে তুমি বলিও যে, তুমি আমার বোন। মূলতঃ তুমি আমার দ্বীনী বোন। আমি ও তুমি ছাড়া এ মাটির উপর কোন মুমিন নেই। এবার রাজা সারার নিকট (তাকে আনার জন্য) লোক পাঠাল। সারাকে উপস্থিত করা হল। অপর দিকে ইবরাহীম (রাঃ) ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালেন। সারা যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন, রাজা তখন তাকে ধরার জন্য হাত বাড়ালো। তখনই সে আল্লাহর গযবে পাকড়াও হল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- তখন তার দম বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি অজ্ঞান হয়ে মাটির উপর পায়ের আঘাত করতে লাগল। অত্যাচারী শাসক নিজের অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ কর, আমি তোমার ক্ষতি করব না। তখন সারা তার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। ফলে সে বিপদ থেকে মুক্তি পেল। অতঃপর সে দ্বিতীয় বার ধরার জন্য হাত বাড়াল। তখন সে পূর্বের ন্যায় কিংবা আরো কঠিনভাবে পাকড়াও হল। এবারও সে বলল, আমার জন্য দো'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তখন সারা আবারো তার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। এরপর সে রাজা তার একজন দারোয়ানকে ডেকে বলল, তোমরা তো আমার কাছে কোন মানুষকে আননি, বরং তোমরা আমার কাছে এনেছ একজন শয়তান। তারপর সে সারার খেদমতের জন্য হাজেরা নামক একজন রমণী দান করলো। অতঃপর সারা ইবরাহীমের কাছে ফিরে আসলেন। এসময় তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছালাতের মধ্যেই হাতের ইশারায় সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি হল? সারা বললেন, আল্লাহ কাফেরের কুপরিকল্পনাকে তার উপরই নিক্ষেপ করেছেন। সে আমার খেদমতের জন্য হাজেরাকে দান করেছে। হাদীছটি বর্ণনার পর আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, হে আকাশের পানির সন্তান! অর্থাৎ আরববাসীগণ এ হাজেরাই তোমাদের আদী মাতা (বুখারী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪৬০)। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা হাজেরার ঈমানের দৃঢ়তা এবং ঈমানের দাবী কেমন হতে পারে, তা বুঝা যায়।

جزاكم الله خيرا

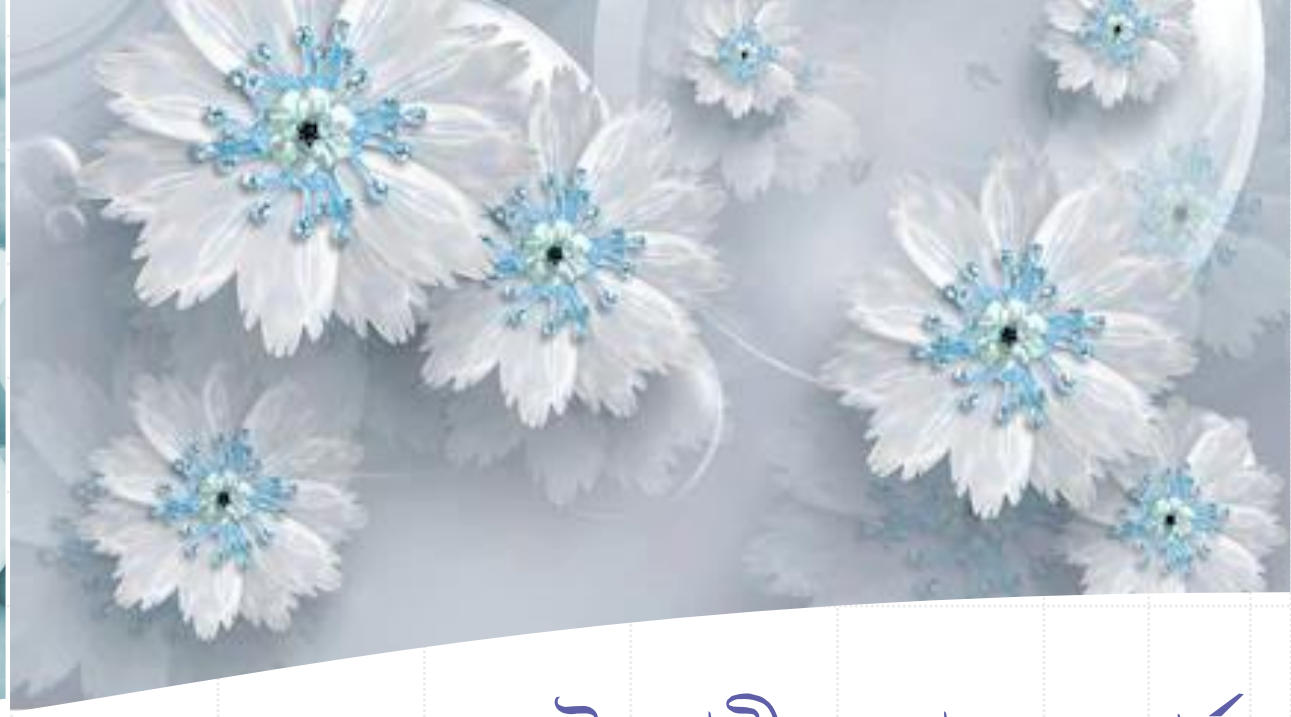

হযরত ইবরাহীম আ ৩য় পর্ব

নবী কাহিনীঃ ৭ম

**আসসালামু'আলাইকুম
ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ**

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

হে রব! আমরা কেবল তোমার উপরেই ভরসা করছি এবং তোমার দিকেই মুখ ফিরাচ্ছি ও তোমার নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল'

(মুমতাহানাহঃ ৪)

কেন‘আনে প্রত্যাবর্তন

ইবরাহীম (আঃ) যথারীতি মিসর থেকে কেন‘আনে ফিরে এলেন। বন্ধ্যা স্ত্রী সারা তার খাদেমা হাজেরাকে প্রাণপ্রিয় স্বামী ইবরাহীমকে উৎসর্গ করলেন। ইবরাহীম তাকে স্ত্রীত্বে বরণ করে নিলেন। পরে দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন তার প্রথম সন্তান ইসমাঈল (আঃ)। এই সময় ইবরাহীমের বয়স ছিল অন্যূন ৮৬ বছর। নিঃসন্তান পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। শুষ্ক মরুতে যেন প্রাণের জোয়ার এলো। বস্ত্তত: ইসমাঈল ছিলেন নিঃসন্তান ইবরাহীমের দো‘আর ফসল। কেননা তিনি বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর নিকটে ‘নেককার সন্তান’ কামনা করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِيْنَ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيْمٍ-)‘ ইবরাহীম বললেন,) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দাও। অতঃপর আমরা তাকে একটি ধৈর্য্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।’ (ছাফফাত ৩৭/১০০-১০১)।

হাজেরাকে মক্কায় নির্বাসন :

মিসর থেকে ফিরে কেনআনে আসার বৎসরাধিককাল পরে প্রথম সন্তান ইসমাঈলের জন্ম লাভ হয়। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তিনি শিশু সন্তান ও তার মা হাজেরাকে মক্কার বিজন পাহাড়ী উপত্যকায় নিঃসঙ্গভাবে রেখে আসার এলাহী নির্দেশ লাভ করেন। বস্ত্ততঃ এটা ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক পরীক্ষা। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ:

হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে শিশু পুত্র ইসমাঈল ও তার মাকে মক্কায় নির্বাসনে রেখে আসার নির্দেশ পান, তখনই তার অন্তরে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, নিশ্চয়ই এ নির্দেশের মধ্যে আল্লাহর কোন মহতী পরিকল্পনা লুক্কায়িত আছে এবং নিশ্চয়ই তিনি ইসমাঈল ও তার মাকে ধ্বংস করবেন না। অতঃপর এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি সহ তাদের বিজনভূমিতে রেখে যখন ইবরাহীম (আঃ) একাকী ফিরে আসতে থাকেন, তখন বেদনা-বিস্মিত স্ত্রী হাজেরা ব্যাকুলভাবে তার পিছে পিছে আসতে লাগলেন। আর স্বামীকে এর কারণ জিজ্ঞেস করতে থাকেন। কিন্তু বুকে বেদনার পাষাণ বাঁধা ইবরাহীমের মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। তখন হাজেরা বললেন, আপনি কি আল্লাহর হুকুমে আমাদেরকে এভাবে ফেলে যাচ্ছেন? ইবরাহীম ইশারায় বললেন, হ্যাঁ। তখন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অটল বিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে হাজেরা বলে উঠলেন,

‘ إِذَنْ لاَيُضَيِّعُنَا اللهُ তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না। ফিরে এলেন তিনি সন্তানের কাছে। দু’একদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে পানি ও খেজুর। কি হবে উপায়? খাদ্য ও পানি বিহনে বুকের দুধ শুকিয়ে গেলে কচি বাচ্চা কি খেয়ে বাঁচবে। পাগলপরা হয়ে তিনি মানুষের সন্ধানে দৌঁড়াতে থাকেন ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ের এ মাথা আর ও মাথায়।

এভাবে সপ্তমবারে তিনি দূর থেকে দেখেন যে, বাচ্চার পায়ের কাছ থেকে মাটির বুক চিরে বেরিয়ে আসছে ঝর্ণার ফল্গুধারা, জিব্রীলের পায়ের গোড়ালি বা তার পাখার আঘাতে যা সৃষ্টি হয়েছিল। ছুটে এসে বাচ্চাকে কোলে নিলেন অসীম মমতায়। স্নিগ্ধ পানি পান করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। হঠাৎ অদূরে একটি আওয়ায শুনে তিনি চমকে উঠলেন। উনি জিবরীল। বলে উঠলেন,

لا تخافوا الضَّيعةَ، إنَّ هذا بيتُ الله يَبْنِى هذا الغلامُ و أبوه وإن الله لايُضيعُ أهلَه-

‘আপনারা ভয় পাবেন না। এখানেই আল্লাহর ঘর। এই সন্তান ও তার পিতা এ ঘর সত্বর পুনর্নির্মান করবেন। আল্লাহ তাঁর ঘরের বাসিন্দাদের ধ্বংস করবেন না’। বলেই শব্দ মিলিয়ে গেল’।

অতঃপর শুরু হল ইসমাঈলী জীবনের নব অধ্যায়। পানি দেখে পাখি আসলো। পাখি ওড়া দেখে ব্যবসায়ী কাফেলা আসলো। তারা এসে পানির মালিক হিসাবে হাজেরার নিকটে অনুমতি চাইলে তিনি এই শর্তে মনযুর করলেন যে, আপনাদের এখানে বসতি স্থাপন করতে হবে। বিনা পয়সায় এই প্রস্তাব তারা সাগ্রহে কবুল করল। এরাই হ’ল ইয়ামন থেকে আগত বনু জুরহুম গোত্র। বড় হয়ে ইসমাঈল এই গোত্রে বিয়ে করেন। এঁরাই কা‘বা গৃহের খাদেম হন এবং এদের শাখা গোত্র কুরায়েশ বংশে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটে।

ওদিকে ইবরাহীম (আঃ) যখন স্ত্রী ও সন্তানকে রেখে যান তখন হাজেরার দৃষ্টির আড়ালে গিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন এই বলে,

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ- (ابراهيم ٣٧)-

‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমি আমার পরিবারের কিছু সদস্যকে তোমার মর্যাদামন্ডিত গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় বসবাসের জন্য রেখে যাচ্ছি। প্রভু হে! যাতে তারা ছালাত কায়েম করে। অতএব কিছু লোকের অন্তরকে তুমি এদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর। সম্ভবত: তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে’।ইবরাহীম ১৪/৩৭; বুখারী ইবনু আববাস (রাঃ) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছের সারসংক্ষেপ; ‘নবীদের কাহিনী’ অধ্যায় হা/৩৩৬৪।

ইবরাহীমের দো‘আ আল্লাহ এমন দ্রুত কবুল করেছিলেন যে, দু’একদিনের মধ্যেই সেখানে সৃষ্টি হয় পানির ফোয়ারা, যা যমযম কূয়া নামে পরিচিত হয় এবং যার উৎসধারা বিগত প্রায় সোয়া চার হাযার বছর ধরে আজও সমভাবে বহমান। কিন্তু এই পানির রূপ-রস-গন্ধ কিছুরই কোন পরিবর্তন হয়নি। এ পানির কোন হরাস-বৃদ্ধি নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এ পানিতে এমন সব উপাদান রয়েছে, যা মানুষের জন্য খাদ্য ও পানীয় উভয় চাহিদা মেটাতে সক্ষম। পৃথিবীর অন্য কোন পানিতে এ গুণ নেই। দৈনিক লাখ লাখ গ্যালন পানি ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও এ পানির কোন ক্ষয় নেই, লয় নেই, কমতি নেই। এর কারণ অনুসন্ধানে বছরের পর বছর চেষ্টা করেও বৈজ্ঞানিকেরা ব্যর্থ হয়েছেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

তখন থেকে অদ্যাবধি মক্কা মু'আয্যমায় চাষাবাদের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সারা পৃথিবী হ'তে তাবৎ ফল-ফলাদি সর্বদা সেখানে আমদানী হয়ে থাকে এবং সর্বদা অধিকহারে মওজূদ থাকে। আধুনিক বিশ্বের কোন শহরই এর সাথে তুলনীয় নয়। নিঃসন্দেহে এটা হল ইবরাহীমের দোআর অন্যতম ফসল।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আয় বলা হয়েছিল, 'আমি আমার সন্তানকে এখানে রেখে যাচ্ছি যেন তারা এখানে ছালাত কায়েম করে'। আল্লাহর রহমতে সেদিন থেকে অদ্যাবধি এখানে ছালাত, ত্বাওয়াফ ও অন্যান্য ইবাদত সর্বদা জারি আছে।

দো'আয় তিনি বলেছিলেন, 'মানব সমাজের কিছু অংশের হৃদয়কে তুমি এদের প্রতি ঝুঁকিয়ে দাও'। নিঃসন্দেহে সেই অংশটি হ'ল সারা বিশ্বের মুসলিম সমাজ। ইবরাহীম (আঃ) জানতেন যে, বিশ্বের সমস্ত লোক কখনো মুমিন হবে না। তাছাড়া তাবৎ বিশ্ব যদি কা'বার প্রতি ঝুঁকে পড়ত, তাহ'লে সেখানে বসবাস, স্থান সংকুলান ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার সংকট দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। তখন থেকে এযাবত সর্বদা একদল শক্তিশালী ও ধর্মপরায়ণ মানুষ মক্কার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। দেড় হাযার বছর পূর্বে খৃষ্টান গভর্ণর আবরাহার সকল প্রচেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয়েছিল, ক্বিয়ামত অবধি শত্রুদের সকল চক্রান্ত এভাবেই ব্যর্থ হবে ইনশাআল্লাহ।

কেউ কেউ প্রমাণ নিতে চেষ্টা করেছেন যে, বায়তুল্লাহর ভিত্তি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। কোন কোন মুফাসসির এ আয়াতের এবং বিভিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে বলেনঃ সর্বপ্রথম আদম 'আলাইহিস সালাম বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেন। নূহের মহাপ্লাবনের পর ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এই ভিত্তির উপরেই বায়তুল্লাহ পূনর্নির্মাণের আদেশ দেয়া হয়। জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। [কুরতুবী] তবে সহীহ কোন দলীল সরাসরি এটা প্রমাণ করে না যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পূর্বে কেউ কা'বা ঘর বানিয়েছে। বিভিন্ন দুর্বল বর্ণনায় আদম আলাইহিস সালাম এবং পরবর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু জাতির মক্কায় আসার কথা এসেছে, কিন্তু সেগুলো সহীহ হাদীসের বিপরীতে টিকে না। যেখানে সরাসরি সহীহ হাদীসে এসেছে যে, "প্রথম মাসজিদ বাইতুল্লাহিল হারাম তারপর বাইতুল মাকদিস, আর এ দুয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো চল্লিশ বছরের"। [দেখুনঃ মুসলিমঃ ৫২০]

মানুষের জন্য সাঈ গ্রন্থের দু'টি চিহ্নের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করা সুন্নাত, কারণ এটাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী সাহাবীগণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের হজ্জের আদব-কায়দা আমার নিকট থেকে শিখে নাও। (সহিহ মুসলিম, জাবির থেকে বর্ণিত)
নারীরা অবশ্য দৌড়ায় না, কারণ তাদের নিজেকে ঢেকে রাখতে হবে এবং শালীন হতে হবে এবং দৌড়াদৌড়ি তাদের দেহ এবং তাদের কমনীয়তা প্রকাশ করতে পারে।
শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) থেকে পুরুষদের দৌড়ানোর কারণ হল: "এই স্থানে একটি উপত্যকা ছিল, অর্থাৎ, বৃষ্টির জলের জন্য একটি চ্যানেল, এবং একটি উপত্যকা সাধারণত খাড়া এবং বালুকাময় ছিল, তাই এতে স্বাভাবিকভাবে হাঁটা কঠিন ছিল, তাই একজনকে দৌড়াতে হয়।
সাঈর পেছনের উদ্দেশ্য হলো, ইসমাঈল (আঃ)-এর মায়ের কাহিনী স্মরণ করাঃ যখন ইবরাহীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ও তার পুত্রকে এই স্থানে রেখে গেলেন এবং তার সাথে এক চামড়া পানি ও খেজুর রেখে গেলেন; মা খেজুর খাওয়া ও পানি পান করতে লাগলেন এবং ছেলেকে বুকের দুধ খাওয়ালেন। অতঃপর পানি ও খেজুর ফুরিয়ে গেল, ফলে সে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল এবং তার দুধ শুকিয়ে গেল।
শিশুটি ক্ষুধার্ত হয়ে ক্ষুধায় কাঁদতে শুরু করল। তিনি নিজেকে একটি কঠিন অবস্থানে আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি দেখলেন যে তার নিকটতম পাহাড়টি আস-সাফা , তাই তিনি আস-সাফায় গেলেন এবং এই আশায় শুনতে লাগলেন যে তিনি কারও কথা শুনতে পাবেন, কিন্তু তিনি কারও কথা শুনতে পেলেন না। অতঃপর সে এসে অন্য দিকে আল-মারওয়ার দিকে রওনা দিল। যখন তিনি উপত্যকার তলদেশে নেমে এলেন, তখন তিনি আর তার ছেলেকে দেখতে পেলেন না, তাই তিনি দ্রুত দৌড়াতে শুরু করলেন, যতক্ষণ না তিনি উপরে উঠলেন যাতে তিনি তার ছেলেকে দেখতে পান। তিনি আল-মারওয়াহ থেকে শুনতে শুনতে উপরে উঠলেন, কিন্তু তিনি কিছুই শুনলেন না। যতক্ষণ না তিনি সাতবার এই কাজ করলেন ততক্ষণ তিনি এভাবেই চলতে থাকলেন। তারপর তিনি একটি শব্দ শুনতে পেলেন, কিন্তু তিনি জানতেন না যে এটি কী। অতঃপর তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহর নির্দেশে জিবরাঈল (আঃ) নেমে এসেছেন এবং বর্তমানে যেখানে জমজম আছেন সেখানে তিনি তার ডানা বা পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন। (আশ-শারহুল মুমতি', ৭/২৬৯) আর আল্লাহই ভালো জানেন। **Source: Islam Q&A**

5 Lessons We Can Learn From Hajar
Co-authored by Musa Bukhari

এটাই হাজার (রা.) এর উত্তরাধিকার।

হাজেরা একজন মুমিনের বহু গুণাবলীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এখানে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করা উচিত:

১. আশাবাদ, আল্লাহর কল্যাণ চিন্তা করার মাধ্যমে

"আমার বান্দা আমার কাছ থেকে যেমন আশা করে আমিও তেমনই, সুতরাং সে যদি আমার কাছ থেকে ভালো চিন্তা করে তবে সে তা পাবে এবং যদি সে আমার সম্পর্কে মন্দ চিন্তা করে তবে সে তা পাবে। (বুখারী)

ইব্রাহিমের তাকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করার পর হাজেরা বুঝতে পারলেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ। হাজেরার প্রতিক্রিয়া দুটি প্রশংসনীয় গুণাবলী প্রদর্শন করে।

প্রথমত, তিনি তার স্বামীর জন্য ভাল চিন্তা করেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তিনি এত গুরুতর কিছু করবেন না।

দ্বিতীয়তঃ হাজেরা বললেন, তাহলে তিনি আমাদের অবহেলা করবেন না। (বুখারী), এটা মেনে নেয় যে, তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হবে তা সত্ত্বেও আল্লাহ তার এবং তার সন্তানের যত্ন নেবেন। সে আল্লাহর ভালো চিন্তা করত, তাঁর আদেশ-নিষেধ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি এবং রাগ ও ভয়ে ইবরাহীমের পেছনে ধাওয়া করত না।

যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই যথেষ্ট। (সূরা তালাক ৬৫:৩)

যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনিই যথেষ্ট। (সূরা তালাক ৬৫:৩)

২. তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর নির্ভরতা)

হাজেরা আল্লাহর ওপর ভরসা ও ভরসা রাখতেন। যখন তার সাথে থাকা সামান্য খাবার এবং পানীয় শেষ হয়ে গেল, তখন তার বাচ্চা প্রচণ্ড ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অতিরিক্ত কাঁদতে শুরু করল। তবে হজেরা হতাশ হননি। বরং তাকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করতেন।

তার চেয়েও বড় কথা, তার বিশ্বাস হাজেরাকে ইসলামে অবদান রাখার অনুমতি দিয়েছে, যদিও আমরা আজও তা অনুশীলন করছি। বারবার দুটো পাহাড় বেয়ে হেঁটে হেঁটে হেঁটে সাহায্যের সন্ধান করছিলেন তিনি; হাজেরা তাঁর অধ্যবসায়ের জন্য যা করতেন তা আজ হজের অন্যতম আনুষ্ঠানিকতা হিসাবে অনুশীলন করা হয় - সাফা এবং মারওয়া। হাজেরার কর্মকাণ্ড আজ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভের জন্য অবদান রাখছে।

যদি আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেন, তাহলে কেউ তোমাদের পরাভূত করতে পারবে না, আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তবে তার পরে আর কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? সুতরাং মুমিনগণ আল্লাহর উপর ভরসা করুক। (3:160)

৩. সবর (ধৈর্যশীল)

হাজেরার বিচারের পুরোটা সময় সাবরের থিম বজায় থাকে। শিশুকে নিয়ে পরিত্যক্ত হওয়া থেকে শুরু করে খাবার ও পানি ফুরিয়ে যাওয়া, পানির খোঁজে বেশ কয়েকবার পাহাড়ে ওঠা-নামা পর্যন্ত হাজেরা কখনো হাল ছাড়েননি। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষার সুন্দর সারাংশ দেখায় - এটি আমাদের ধৈর্য শেখায়, এবং এটি আমাদের চরিত্রের একটি প্রদর্শন। আল্লাহ আমাদের এই পরীক্ষাগুলি কেবল তাঁর সাথে সংযোগ জোরদার করতে এবং আমাদের সংগ্রামের মাধ্যমে পুরষ্কার অর্জনের জন্য পাঠান না, তবে আমাদের পরিপূর্ণ করার জন্য গভীর খননও করেন সম্ভাবনা এবং তারপর শ্রেষ্ঠত্ব। এটি ধৈর্যের ফলপ্রসূ ও চলমান উপকারিতা, যার উদাহরণ হাজেরা।

ইমাম আবু মুসলিম আল-খাওলানী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "দুনিয়া ত্যাগ করার অর্থ যা অনুমোদিত তা হারাম করা নয় এবং সম্পদ অপচয় করা নয়। নিশ্চয়ই দুনিয়া ত্যাগ করার অর্থ নিজের হাতের চেয়ে আল্লাহর হাতে যা আছে তার উপর অধিক নির্ভরশীল হওয়া। আপনি যদি কোন দুর্দশায় পীড়িত হন, তা হলে আপনি যদি তা সহ্য করে চলেন, তা হলে পুরস্কারের আশা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।“

৪. তাকওয়া (আল্লাহকে ভয় করা)

তার বিচারে হাজেরার প্রতিক্রিয়া তাকওয়ায় ভরা। তিনি সর্বদা আল্লাহর উপস্থিতির প্রতি সচেতন থাকতেন এবং তাঁর সম্পর্কে কখনও খারাপ চিন্তা করতেন না; এটি ছিল সেই ভিত্তি যা তাকে আশাবাদ এবং ধৈর্য অনুশীলন করতে দেয়।

হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই বেশী মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে বেশী তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।(সূরা হুজুরাত:১৩)

বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তৃতা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, “হে লোকজন! সাবধান তোমাদের আল্লাহ একজন। কোন অনারবের ওপর কোন আরবের ও কোন আরবের ওপর কোন অনারবের কোন কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের ও কোন শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই আল্লাহভীতি ছাড়া। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহভীরু সেই আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাবান। আমি কি তোমাদেরকে পৌঁছিয়েছি? তারা বলল, আল্লাহর রাসূল পৌঁছিয়েছেন। তিনি বললেন, তাহলে যারা এখানে উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এ বাণী পৌছিয়ে দেয়।” [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৪১১]

৫. বিচ্ছিন্নতা

ইব্রাহিমকে কেন তাকে এবং তার শিশুকে মরুভূমিতে রেখে আসতে হয়েছিল তা বোঝার মাধ্যমে হাজার বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না যে তাকে কত ঘন্টা বা দিনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে, তবে তার সঠিক জায়গায় বিচ্ছিন্নতা তাকে আল্লাহর প্রতি আরও গুরুত্বপূর্ণ আসক্তির দিকে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করেছিল।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পরীক্ষাটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে এবং একমাত্র তিনিই তাকে অবকাশ দিতে পারেন। এটি ছিল হাজেরার আল্লাহ ব্যতীত সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উদাহরণ, এমনকি স্বামীর প্রতি তার ভালবাসা ও নির্ভরতা থেকেও।

হজরত আবু আব্বাস সাহল ইবনে সা'দ আস সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী (সা.) এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে এমন কাজের নির্দেশ দাও, যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষ আমাকে ভালোবাসবে। তিনি বললেনঃ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হও, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। মানুষের যা আছে তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করুন এবং তারা আপনাকে ভালবাসবে। (ইবনে মাজাহ)

হাজেরার চরিত্রটি সত্যিই অনুপ্রেরণামূলক। তিনি আল্লাহর আনুগত্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, এমনকি যখন তাকে অকল্পনীয় কষ্টের সাথে পরীক্ষা ও করা হচ্ছিল। হাজার থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি এবং এমন অনেক গুণাবলী রয়েছে যা আমরা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে শিখতে পারি।

আল্লাহ আমাদেরকে হাজেরা ও নবী-রাসূলগণের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে আমাদের ইবাদত-বন্দেগিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার তৌফিক দান করুন এবং আমরা যেন জান্নাতে সৎকর্মশীলদের সান্নিধ্যে থাকি।

ইবরাহীমের কথিত তিনটি মিথ্যার ব্যাখ্যা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, ‘ لم يَكْذِبْ إبراهيمُ عليه الصلاةُ والسلام إلاّ ثلاثَ كَذَباتٍ، ইবরাহীম (আঃ) তিনটি ব্যতীত কোন মিথ্যা বলেননি’। উক্ত তিনটি মিথ্যা ছিল-

(১) মেলায় না যাবার অজুহাত হিসাবে তিনি বলেছিলেন ‘ إِنِّيْ سَقِيْمٌ আমি অসুস্থ’ (ছাফফাত ৩৭/৮৯)।

(২) মূর্তি ভেঙ্গেছে কে? এরূপ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا বরং এই বড় মূর্তিটাই এ কাজ করেছে’ (আম্বিয়া ২১/৬৩)।

(৩) মিসরের লম্পট রাজার হাত থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রী সারা-কে তিনি বোন হিসাবে পরিচয় দেন। ছহীহ বুখারী হা/৩৩৫৮ ‘নবীদের কাহিনী’ অধ্যায়।

হাদীছে উক্ত তিনটি বিষয়কে ‘মিথ্যা’ শব্দে উল্লেখ করা হ’লেও মূলতঃ এগুলির একটাও প্রকৃত অর্থে মিথ্যা ছিল না। বরং এগুলি ছিল আরবী অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় ‘তাওরিয়া’ ((التورية বা দ্ব্যর্থ বোধক পরিভাষা। যেখানে শ্রোতা বুঝে এক অর্থ এবং বক্তার নিয়তে থাকে অন্য অর্থ।

যেমন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন হযরত আয়েশার কাছে তার এক বৃদ্ধা খালাকে দেখে বললেন, কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। একথা শুনে খালা কান্না শুরু করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তারা তখন সবাই যুবতী হয়ে যাবে’। শামায়েলে তিরমিযী; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৯৮৭।

হিজরতের সময় পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জওয়াবে আবুবকর (রাঃ) বলেন, ‘ هذا الرجلُ يَهْدِيني الطريقَ ইনি আমাকে পথ দেখিয়ে থাকেন’।বুখারী (দেওবন্দ ১৯৮৫) ১/৫৫৬ পৃঃ হা/৩৯১১ ‘নবীর হিজরত’ অনুচ্ছেদ ; আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৬৮।

এতে লোকটি ভাবল, উনি একজন সাধারণ পথপ্রদর্শক ব্যক্তি মাত্র। অথচ আবুবকরের উদ্দেশ্য ছিল তিনি আমাদের নবী অর্থাৎ ধর্মীয় পথপ্রদর্শক ((يهديني الى طريق الجنة অনুরূপভাবে যুদ্ধকালে রাসূল (ছাঃ) একদিকে বেরিয়ে অন্য দিকে চলে যেতেন। যাতে তাঁর গন্তব্য পথ গোপন থাকে। এগুলি হ’ল উক্তিগত ও কর্মগত তাওরিয়ার উদাহরণ।

ইবরাহীমী আ জীবনের পরীক্ষা সমূহ

ইবরাহীমের আ পরীক্ষা সমূহ তাঁর যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য ছিল না বা তাঁর কোন অপরাধের সাজা হিসাবে ছিল না। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে লালন করে পূর্ণত্বের মহান স্তরে পৌছে দেওয়া এবং তাঁকে আগামী দিনে বিশ্বনেতার মর্যাদায় সমাসীন করা। সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে এটা দেখিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহর নিকটে প্রিয় ও সম্মানিত বান্দাগণকে দুনিয়াতে বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়।

মুছ'আব ইবনু সা'দ (রাহঃ) হ'তে তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি (সাদ) বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! মানুষের মাঝে কার বিপদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি বললেন, নবীদের বিপদের পরীক্ষা, তারপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। এরপর যারা নেককার তাদের বিপদের পরীক্ষা। মানুষকে তার ধর্মানুরাগের অনুপাত অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। তুলনামূলকভাবে যে লোক বেশী ধার্মিক তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে তাহ'লে তাকে সে মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়। অতএব, বান্দার উপর বিপদাপদ লেগেই থাকে, অবশেষে তা তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয় যে, সে যমীনে চলাফেরা করে অথচ তার কোন গুনাহই থাকে না'। তিরমিযী হা/২৩৯৮; ইবনু মাজাহ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/

আল্লাহর সুন্দর গুণাবলীর মধ্যে ' رَبُّهُ তার পালনকর্তা' গুণটিকে খাছ করে বলার মধ্যে স্বীয় বন্ধুর প্রতি স্নেহ ও তাকে বিশেষ অনুগ্রহে লালন করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এক্ষণে তাঁর পরীক্ষার সংখ্যা কত ছিল সে বিষয়ে কুরআন নির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করেনি।

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

স্মরণ করো যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করলেন এবং সেসব পরীক্ষায় সে পুরোপুরি উত্তরে গেলো, তখন তিনি বললেনঃ "আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতার পদে অধিষ্ঠত করবো। ইবরাহীম বললোঃ "আর আমার সন্তানদের সাথেও কি এই অংগীকার ?" জবাব দিলেনঃ "আমার এ অংগীকার যালেমদের ব্যাপারে নয়।" বাক্বারাহ ২/১২৪)

কেবল বলেছে, ' بِكَلِمَاتٍ অনেকগুলি বাণী দ্বারা। অর্থাৎ শরী'আতের বহুবিধ আদেশ ও নিষেধ সমূহ দ্বারা। 'কালেমাত' শব্দটি বিবি মারিয়ামের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, ' وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا মারিয়াম তার পালনকর্তার বাণী সমূহকে সত্যে পরিণত করেছিল' (তাহরীম ৬৬/১২)। ইবরাহীমের জীবনে পরীক্ষার সংখ্যা কত ছিল এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, ইসলামের ৩০টি অংশ রয়েছে।

যার ১০টি সূরা তওবায় (১১২ আয়াতে),

১১২. তারা তাওবাহকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূ'কারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশদাতা, অসৎকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী; আর আপনি মুমিনদেরকে শুভ সংবাদ দিন। তাওবাঃ ১১২

ইবরাহীম তার বাপের জন্য যে মাগফিরাতের দোয়া করেছিল তা তো সেই ওয়াদার কারণে ছিল যা সে তার বাবার সাথে করেছিল্ কিন্তু যখন তার কাছে একথা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, তার বাপ আল্লাহর দুশমন তখন সে তার প্রতি বিমুখ হয়ে গেছে৷ যথার্থই ইবরাহীম কোমল হৃদয়, আল্লাহভীরু ও ধৈর্যশীল ছিল৷ তাওবাঃ১১৪

হযরত ইবরাহীম তার মুশরিক পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় যে কথা বলেছিলেন সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেনঃ

আপনার প্রতি সালাম, আপনার জন্য আমি আমার রবের কাছে দোয়া করবো যেন তিনি আপনাকে মাফ করে দেন৷ তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান৷ (মারয়ামঃ ৪৭)

তিনি আরো বলেছিলেনঃ

আমি আপনার জন্য অবশি ক্ষমা চাইবো৷ তবে আপনাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা আমার নেই৷ (আল মুমতাহিনাঃ ৪)

উপরক্ত ওয়াদার ভিত্তিতে তিনি নিজের পিতার জন্য এ দোয়া করেছিলেন

আর আমার পিতাকে মাফ করে দাও, তিনি পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত ছিলেন৷ আর যেদিন সকল মানুষকে উঠানো হবে সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না৷ যেদিন ধনসম্পদ এবং সন্তান সন্ততি কারোর কোন কাজে লাগবে না৷ একমাত্র সেই নাজাত পাবে , যে আল্লাহর সামনে হাযির হবে বিদ্রোহমুক্ত হৃদয় নিয়ে৷ (আশ শুআরাঃ ৮৬-৮৯)

এ দোয়া তো প্রথমত অত্যন্ত সতর্ক ও সংযত ভাষায় করা হয়েছিল৷ কিন্তু পরক্ষনেরই হযরত ইবরাহীম চিন্তা করলেন যে, তিনি যে ব্যক্তির জন্য দোয়া করেছেন সে তো ছিল প্রকাশ্য আল্লাহদ্রোহী এবং আল্লাহর দীনের ঘোরতর শত্রু তখন তিনি এ থেকে বিরত হলেন এবং একজন যথার্থ বিশ্বস্ত মুমিনের মত বিদ্রোহীর প্রতি সহানুভূতি দেখানো থেকে পরিষ্কারভাবে সরে দাঁড়লেন৷ অথচ এ বিদ্রোহী ছিল তার পিতা, যে এক সময় স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে তাকে লালন পালন করেছিল৷

১০টি সূরা মুমিনূনে (১-৯ আয়াতে) ও সূরা মা‘আরিজে (২২-৩৪ আয়াতে) এবং বাকী ১০টি সূরা আহযাবে (৩৫ আয়াতে) বর্ণিত হয়েছে।

যার সব ক’টি ইবরাহীম (আঃ) পূর্ণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে সনদ দিয়ে বলেন, ‘ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِيْ وَفَّى এবং ইবরাহীমের ছহীফায়, যিনি (আনুগত্যের অঙ্গীকার) পূর্ণ করেছিলেন’ (নাজম ৫৩/৩৭)।হাকেম ২/৫৫২ সনদ ছহীহ; তাফসীর ইবনে কাছীর, বাক্বারাহ ১১৪-এর টীকা দ্রষ্টব্য। তবে ইবনু জারীর ও ইবনু কাছীর উভয়ে বলেন, ইবরাহীমের জীবনে যত সংখ্যক পরীক্ষাই আসুক না কেন আল্লাহ বর্ণিত ‘কালেমাত’ বহু বচনের শব্দটি সবকিছুকে শামিল করে’ (ইবনু কাছীর)।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পূর্বে ইসলামের ত্রিশ অংশের পূর্ণ বাস্তবায়ন কেউ করতে পারেনি, এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, “আর ইবরাহীম যিনি পূর্ণ করেছেন।” [মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/৪৭০]

১। অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ,
২। যারা তাদের সালাতে ভীতি-অবনত
৩। আর যারা আসার কর্মকাণ্ড থেকে থাকে বিমুখ।
৪। এবং যারা যাকাতে সক্রিয়
৫। আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে রাখে সংরক্ষিত
৬। নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া, এতে তারা হবে না নিন্দিত
৭। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারাই হবে সীমালংঘনকারী
৮। আর যারা রক্ষা করে নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি
৯। আর যারা নিজেদের সালাতে থাকে যত্নবান
সূরা মুমিনূনে (১-৯ আয়াতে)

২২. তবে সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া
২৩. যারা তাদের সালাতে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত
২৪. আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে।
২৫. যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের,
২৬. আর যারা প্রতিদান দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।
২৭. আর যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত—
২৯. আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গসমূহের হিফাযতকারী
৩৩. আর যারা তাদের সাক্ষ্যসমূহে অটল
৩৪. আর যারা তাদের সালাতের হিফাযত করে
সূরা মা‘আরিজে ২২-৩৪ আয়াতে

বাকী ১০টি সূরা আহযাবে (৩৫ আয়াতে) বর্ণিত হয়েছে।

৩৫. নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ সওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্কে অধিক স্মরণকারী নারী—তাদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

ইবরাহীমী জীবন মানেই পরীক্ষার জীবন। নবী হবার পর থেকে আমৃত্যু তিনি পরীক্ষা দিয়েই জীবনপাত করেছেন। এভাবে পরীক্ষার পর পরীক্ষা নিয়ে তাঁকে পূর্ণত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে। অবশেষে তাঁকে ‘বিশ্বনেতা’ ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ- (البقرة ১২৪)-

‘যখন ইবরাহীমকে তার পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তাতে উত্তীর্ণ হ’লেন, তখন আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও। তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার যালেমদের পর্যন্ত পৌঁছবে না’ (বাক্বারাহ ২/১২৪)।

বস্ত্ততঃ আল্লাহ ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই বিশ্ব নেতৃত্ব সীমিত রেখেছেন। যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ- ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- (آل عمران ৩৩-৩৪)-

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীম-এর বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে নির্বাচিত করেছেন’। ‘যারা ছিল পরস্পরের বংশজাত। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’ (আলে ইমরান ৩/৩৩, ৩৪)।

বস্ত্ততঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর পরবর্তী সকল নবী তাঁর বংশধর ছিলেন। আলে ইমরান বলতে ইমরান-পুত্র মূসা ও হারূণ ও তাঁদের বংশধর দাঊদ, সুলায়মান, ঈসা প্রমুখ নবীগণকে বুঝানো হয়েছে। যাঁরা সবাই ছিলেন ইবরাহীমের পুত্র ইসহাকের বংশধর।

অপরপক্ষে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন ইবরাহীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলের বংশধর। সে হিসাবে আল্লাহ ঘোষিত ইবরাহীমের বিশ্বনেতৃত্ব যেমন বহাল রয়েছে, তেমনি নবীদের প্রতি অবাধ্যতা, বংশীয় অহংকার এবং যিদ ও হঠকারিতার জন্য যালেম ইহুদী-নাছারাগণ আল্লাহর অভিশাপ কুড়িয়ে বিশ্বের সর্বত্র ধিকৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। এক্ষণে ‘নবীদের পিতা’ ও মিল্লাতে ইসলামিয়াহর নেতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, আমরা সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

ইবরাহীম (আঃ)-এর পরীক্ষা সমূহ ছিল দু'ভাগে বিভক্ত।

(এক) বাবেল জীবনের পরীক্ষা সমূহ এবং

(দুই) কেন'আন জীবনের পরীক্ষা সমূহ।

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনের সঙ্গে পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবনের সুন্দর একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

মুহাম্মাদী জীবনের প্রথমাংশ কেটেছে মক্কায় ও শেষাংশ কেটেছে মদীনায় এবং সেখানেই তিনি পূর্ণতা লাভ করেন ও মৃত্যুবরণ করেন।

ইবরাহীমী জীবনের প্রথমাংশ কেটেছে বাবেল শহরে এবং শেষাংশ কেটেছে কেন'আনে। সেখানেই তিনি পূর্ণতা পেয়েছেন ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

ইবরাহীম (আঃ)-এর বাবেল জীবনের পরীক্ষা সমূহের মধ্যে

(১) মূর্তিপূজারী নেতাদের সাথে তর্কযুদ্ধের পরীক্ষা (২) পিতার পক্ষ থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রাপ্তির পরীক্ষা (৩) স্ত্রী ও ভাতিজা ব্যতীত কেউ তাঁর দাওয়াত কবুল না করা সত্ত্বেও তীব্র সামাজিক বিরোধিতার মুখে একাকী দাওয়াত চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অটল থাকার মাধ্যমে আদর্শ নিষ্ঠার কঠিন পরীক্ষা (৪) তারকাপূজারীদের সাথে যুক্তিগর্ভ তর্কযুদ্ধের পরীক্ষা (৫) কেন্দ্রীয় দেবমন্দিরে ঢুকে মূর্তি ভাঙ্গার মত দুঃসাহসিক পরীক্ষা (৬) অবশেষে রাজদরবারে পৌঁছে সরাসরি সম্রাটের সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পরীক্ষা এবং বিনিময়ে (৭) জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার মর্মান্তিক শাস্তি হাসিমুখে বরণ করে নেবার অতুলনীয় অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া। এছাড়াও সমাজ সংস্কারক হিসাবে জীবনের প্রতি পদে পদে যে অসংখ্য পরীক্ষার সম্মুখীন তাঁকে হর-হামেশা হ'তে হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

উপরে বর্ণিত পরীক্ষাগুলির সবটিতেই ইবরাহীম (আঃ) জয়লাভ করেছিলেন এবং সেগুলির আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করে এসেছি। এক্ষণে আমরা তাঁর কেন'আনী জীবনের প্রধান পরীক্ষাসমূহ বিবৃত করব ইনশাআল্লাহ।

কেন'আনী জীবনের পরীক্ষা সমূহ

১ম পরীক্ষা: দুর্ভিক্ষে পতিত হয়ে মিসর গমন : কেনআনী জীবনে তাঁর প্রথম পরীক্ষা হল কঠিন দুর্ভিক্ষে তাড়িত হয়ে জীবিকার সন্ধানে মিসরে হিজরত করা।

২য় পরীক্ষা: সারাকে অপহরণ : মিসরে গিয়ে সেখানকার লম্পট সম্রাট ফেরাঊনের কুদৃষ্টিতে পড়ে স্ত্রী সারাকে অপহরণের মর্মান্তিক পরীক্ষা।

৩য় পরীক্ষা: হাজেরাকে মক্কায় নির্বাসন

৪র্থ পরীক্ষাঃ খাতনা করন

৫ম পরীক্ষা: পুত্র কুরবানী

পুত্র কুরবানী

একমাত্র শিশু পুত্র ও তার মাকে মক্কায় রেখে এলেও ইবরাহীম (আঃ) মাঝে-মধ্যে সেখানে যেতেন ও দেখা-শুনা করতেন। এভাবে ইসমাঈল ১৩/১৪ বছর বয়সে উপনীত হ'লেন এবং পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার উপযুক্ত হ'লেন। বলা চলে যে, ইসমাঈল যখন বৃদ্ধ পিতার সহযোগী হ'তে চলেছেন এবং পিতৃহৃদয় পুরোপুরি জুড়ে বসেছেন, ঠিক সেই সময় আল্লাহ ইবরাহীমের মহববতের কুরবানী কামনা করলেন। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র নয়নের পুত্তলী ইসমাঈলের মহববত ইবরাহীমকে কাবু করে ফেলল কি-না, আল্লাহ যেন সেটাই যাচাই করতে চাইলেন। ইতিপূর্বে অগ্নিপরীক্ষা দেবার সময় ইবরাহীমের কোন পিছুটান ছিল না। কিন্তু এবার রয়েছে প্রচন্ড রক্তের টান। অগ্নি পরীক্ষায় বাদশাহ তাকে বাধ্য করেছিল। কিন্তু এবারের পরীক্ষা স্বেচ্ছায় ও স্বহস্তে সম্পন্ন করতে হবে। তাই এ পরীক্ষাটি ছিল পূর্বের কঠিন অগ্নি পরীক্ষার চেয়ে নিঃসন্দেহে কঠিনতর। সূরা ছাফফাত ১০২ আয়াত হ'তে ১০৯ আয়াত পর্যন্ত এ বিষয়ে বর্ণিত ঘটনাটি নিম্নরূপ:

'যখন (ইসমাঈল) পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হ'ল, তখন (ইবরাহীম) তাকে বললেন, হে আমার বেটা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবহ করছি। এখন বল তোমার অভিমত কি? সে বলল, হে পিতা! আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে, আপনি তা কার্যকর করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন' (ছাফফাত ৩৭/১০২)।

ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কা থেকে বের করে ৮ কি: মি: দক্ষিণ-পূর্বে মিনা প্রান্তরে নিয়ে যাওয়ার পথে বর্তমানে যে তিন স্থানে হাজীগণ শয়তানকে পাথর মেরে থাকেন, ঐ তিন স্থানে ইবলীস তিনবার ইবরাহীম (আঃ)-কে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। আর তিনবারই ইবরাহীম (আঃ) শয়তানের প্রতি ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন।ইবনু আববাস হ'তে মুসনাদে আহমাদ হা/২৭০৭, ২৭৯৫, সনদ ছহীহ, শো'আয়েব আরনাঊত্ব।

সেই স্মৃতিকে জাগরুক রাখার জন্য এবং শয়তানের প্রতারণার বিরুদ্ধে মুমিনকে বাস্তবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ বিষয়টিকে হজ্জ অনুষ্ঠানের ওয়াজিবাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানেই অনতিদূরে পূর্ব দিকে 'মসজিদে খায়েফ' অবস্থিত।

অতঃপর পিতা-পুত্র আল্লাহ নির্দেশিত কুরবানগাহ 'মিনায়' উপস্থিত হ'লেন। সেখানে পৌঁছে পিতা পুত্রকে তাঁর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন এবং পুত্রের অভিমত চাইলেন। পুত্র তার অভিমত ব্যক্ত করার সময় বললেন, 'ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন'। ইনশাআল্লাহ না বললে হয়ত তিনি ধৈর্য ধারণের তাওফীক পেতেন না। এরপর তিনি নিজেকে 'ছবরকারী' না বলে 'ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত' বলেছেন এবং এর মাধ্যমে নিজের পিতা সহ পূর্বেকার বড় বড় আত্মোৎসর্গকারীদের মধ্যে নিজেকে শামিল করে নিজেকে অহমিকা মুক্ত করেছেন। যদিও তাঁর ন্যায় তরুণের এরূপ স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গের ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছিল বলে জানা যায় না। আল্লাহ বলেন,

‘অতঃপর (পিতা-পুত্র) উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করল এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে শায়িত করল’। ‘তখন আমরা তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম’! ‘তুমি তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান দিয়ে থাকি’। ‘নিশ্চয়ই এটি একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা’। ‘আর আমরা তার পরিবর্তে একটি মহান যবহ প্রদান করলাম’ ‘এবং আমরা এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম’। ‘ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক’ (ছাফফাত ৩৭/১০৩-১০৯)।

সকল মানুষের মুখমন্ডলের (ডানে ও বামে) দুটো) جَبِين কপালের দুই পার্শ্ব) থাকে এবং মাঝে থাকে) جَبهَة কপাল)। অতএব আয়াতের সঠিক অর্থ হবে ‘কাত করে শায়িত করল।’ অর্থাৎ এমনভাবে কাত করে শুইয়ে দিলেন, যেমন পশুকে যবেহ করার সময় ক্বিবলা মুখে কাত করে শোয়ানো হয়। কপাল বা মুখমন্ডলের উপর (অধোমুখে) শোয়ানোর অর্থ করার কারণ হল, প্রসিদ্ধি আছে যে, ইসমাঈল (আঃ) নিজেই কাত করে শোয়ানোর জন্য বলেছিলেন। যাতে তাঁর মুখমন্ডল আব্বার সামনে না থাকে এবং পিতৃস্নেহ আল্লাহর আদেশের উপর প্রাধান্য পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

‘যবেহযোগ্য মহান জন্তু’ একটি দুম্বা ছিল, যা আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে জিবরীল মারফত পাঠিয়েছিলেন। (ইবনে কাসীর) ইসমাঈল (আঃ)-এর পরিবর্তে সেই দুম্বাটি যবেহ করা হয়েছিল এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্ত সুন্নতকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ ও ঈদুল আযহার সব থেকে পছন্দনীয় আমল বলে স্বীকৃতি দেওয়া হল।

বর্তমানে উক্ত মিনা প্রান্তরেই হাজীগণ কুরবানী করে থাকেন এবং বিশ্ব মুসলিম ঐ সুন্নাত অনুসরণে ১০ই যুলহিজ্জাহ বিশ্বব্যাপী শরী‘আত নির্ধারিত পশু কুরবানী করে থাকেন।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

ইবরাহীমকে আল্লাহ স্বপ্নাদেশ করেছিলেন, সরাসরি আদেশ করেননি। এর মধ্যে পরীক্ষা ছিল এই যে, স্বপ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা হ'তে পারত। যেমন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা মহাপাপ। অধিকন্তু পিতা হয়ে নির্দোষ পুত্রকে নিজ হাতে হত্যা করা আরও বড় মহাপাপ। নিশ্চয়ই এমন অন্যায় কাজের নির্দেশ আল্লাহ দিতে পারেন না। অতএব এটা মনের কল্পনা-নির্ভর স্বপ্ন (أضغاث أحلام) হ'তে পারে। কিন্তু ইবরাহীম ঐসব ব্যাখ্যায় যাননি। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এটা 'অহি'। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি পরপর তিনদিন একই স্বপ্ন দেখেন। প্রশ্ন হ'তে পারে, আল্লাহ জিব্রীল মারফত সরাসরি নির্দেশ না পাঠিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠালেন কেন? এর জবাব এই যে, তাহ'লে তো পরীক্ষা হ'ত না, কেবল নির্দেশ পালন হ'ত। ইবরাহীমকে তার স্বপ্নের কাল্পনিক ব্যাখ্যার ফাঁদে ফেলার জন্যই তো শয়তান মাঝপথে বন্ধু সেজে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নির্দেশ পালনের সময় অহেতুক প্রশ্ন সমূহ উত্থাপন ও অধিক যুক্তিবাদের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। বরং সর্বদা তার প্রকাশ্য অর্থের উপরে সহজ-সরলভাবে আমল করে যেতে হবে।

পিতা ও পুত্রের বিশ্বাসগত সমন্বয় ব্যতীত কুরবানীর এই গৌরবময় ইতিহাস রচিত হ'ত না। ইসমাঈল যদি পিতার অবাধ্য হ'তেন এবং দৌড়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন, তাহ'লে আল্লাহর হুকুম পালন করা ইবরাহীমের পক্ষে হয়তবা আদৌ সম্ভব হ'ত না। তাই এ ঘটনার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সমাজের প্রবীণদের কল্যাণময় নির্দেশনা এবং নবীনদের আনুগত্য ও উদ্দীপনা একত্রিত ও সমন্বিত না হ'লে কখনোই কোন উন্নত সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়।

আল্লাহর মহববত ও দুনিয়াবী কোন মহববত একত্রিত হ'লে সর্বদা আল্লাহর মহববতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং দুনিয়াবী মহববতকে কুরবানী দিতে হবে। ইবরাহীম এখানে সন্তানের গলায় ছুরি চালাননি। বরং সন্তানের মহববতের গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন। আর এটাই ছিল পরীক্ষা। যদি কেউ আল্লাহর মহববতের উপরে দুনিয়াবী মহববতকে অগ্রাধিকার দেয়, তখন সেটা হয়ে যায় الإشراك في المحبة বা ভালোবাসায় শিরক। ইবরাহীম ও ইসমাঈল দু'জনেই উক্ত শিরক হ'তে মুক্ত ছিলেন।

এখানে মা হাজেরার অবদানও ছিল অসামান্য। যদি তিনি ঐ বিজন ভূমিতে কচি সন্তানকে তিলে তিলে মানুষ করে না তুলতেন এবং স্রেফ আল্লাহর উপরে ভরসা করে বুকে অসীম সাহস নিয়ে সেখানে বসবাস না করতেন, তাহ'লে পৃথিবী পিতা-পুত্রের এই মহান দৃশ্য অবলোকন করতে পারত না। এজন্যেই বাংলার বুলবুল কাজী নজরুল ইসলাম গেয়েছেন,

ইসহাক জন্মের সুসংবাদ :

পুত্র কুরবানীর ঘটনার পরে ইবরাহীম (আঃ) কেন‘আনে ফিরে এলেন। এসময় বন্ধ্যা স্ত্রী সারাহ্-র গর্ভে ভবিষ্যৎ সন্তান ইসহাক জন্মের সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশতাদের শুভাগমন ঘটে। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, উক্ত ফেরেশতাগণ ছিলেন হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল। তারা মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। এ বিষয়ে কুরআনী বক্তব্য নিম্নরূপ:

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرَى قَالُوْا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاء بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ- (هود ৬৯)-

‘আর আমাদের প্রেরিত সংবাদবাহকগণ (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ) ইবরাহীমের নিকটে সুসংবাদ নিয়ে এল এবং বলল, সালাম। সেও বলল, সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই সে একটা ভূণা করা বাছুর এনে (তাদের সম্মুখে) পেশ করল’ (হূদ ১১/৬৯)।

‘কিন্তু সে যখন দেখল যে, মেহমানদের হাত সেদিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন সে সন্দেহে পড়ে গেল ও মনে মনে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগল (কারণ এটা তখনকার যুগের খুনীদের নীতি ছিল যে, যাকে তারা খুন করতো, তার বাড়ীতে তারা খেত না)। তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না। আমরা লূত্বের কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তার স্ত্রী (সারা) নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। আমরা তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরে (তার পুত্র) ইয়াকূবেরও। সে বলল, হায় কপাল! আমি সন্তান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ। এতো ভারী আশ্চর্য কথা! তারা বলল, আপনি আল্লাহর নির্দেশের বিষয়ে আশ্চর্য বোধ করছেন? হে গৃহবাসীগণ! আপনাদের উপরে আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রশংসিত ও মহিমময়’ (হূদ ১১/৭০-৭৩)। একই ঘটনা আলোচিত হয়েছে সূরা হিজর ৫২-৫৬ ও সূরা যারিয়াত ২৪-৩০ আয়াত সমূহে। উল্লেখ্য যে, অধিক মেহমানদারীর জন্য ইবরাহীমকে ‘আবুয যায়ফান’ (ابو الضيفان) বা মেহমানদের পিতা বলা হ’ত। এই সময় বিবি সারাহর বয়স ছিল অন্যূন ৯০ ও ইবরাহীমের ছিল ১০০ বছর। সারাহ নিজেকে বন্ধ্যা মনে করতেন এবং সেকারণেই সেবিকা হাজেরাকে স্বামীর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন ও তাঁর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন সন্তান লাভের জন্য। অথচ সেই ঘরে ইসমাঈল জন্মের পরেও তাকে তার মা সহ মক্কায় নির্বাসনে রেখে আসতে হয় আল্লাহর হুকুমে। ফলে সংসার ছিল আগের মতই নিরানন্দময়। কিন্তু আল্লাহর কি অপূর্ব লীলা! তিনি শুষ্ক নদীতে বান ডাকাতে পারেন। তাই নিরাশ সংসারে তিনি আশার বন্যা ছুটিয়ে দিলেন। যথাসময়ে ইসহাকের জন্ম হ’ল। যিনি পরে নবী হ’লেন এবং তাঁরই পুত্র ইয়াকূবের বংশধারায় ঈসা পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে হাযার হাযার নবী প্রেরিত হ’লেন। ফলে হতাশ ও বন্ধ্যা নারী সারাহ এখন কেবল ইসহাকের মা হলেন না। বরং তিনি হলেন হাযার হাযার নবীর মা বা ‘উম্মুল আম্বিয়া’ (ام الأنبياء)। ওদিকে মক্কায় ইসমাঈলের বয়স তখন ১৩/১৪ বৎসর। যাকে বলা হয়ে থাকে ‘আবুল আরব’ (ابو العرب) বা আরব জাতির পিতা।

১১৩. আর আমরা ইবরাহীমের ওপর বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাকের উপরও; তাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুহসিন এবং কিছু সংখ্যক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী। সূরা সাফফাতঃ ১১৩

তাঁদের উভয়ের বংশ বিস্তার করেছিলাম। অধিকাংশ আম্বিয়া ও রসূলদের আগমন তাঁদের বংশ থেকেই ঘটেছে। ইসহাক (আঃ)-এর পুত্র ইয়াকুব (আঃ) ছিলেন, যাঁর বারটি সন্তান থেকে বানী ইস্রাঈলের বারটি গোত্র সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাঁদের বংশ থেকেই বানী ইস্রাঈল জাতি বিস্তার লাভ করে এবং অধিকাংশ আম্বিয়া তাঁদের মধ্য থেকেই আগমন করেন। ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ) থেকে আরবদের বংশ বিস্তার হয় এবং তাদের মধ্য হতে শেষ পয়গম্বর মুহাম্মাদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

তারা শিরক, পাপাচার, অত্যাচার ও ফাসাদ করে। ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরে বরকত থাকা সত্ত্বেও এখানে তাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ ও অত্যাচারী বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, মর্যাদাসম্পন্ন বাপদাদা ও বংশের সম্পর্ক আল্লাহর নিকট কোন মূল্য রাখে না। সেখানে শুধু ঈমান ও নেক আমলের গুরুত্ব আছে। ইয়াহুদী ও নাসারাগণ যদিও ইসহাক (আঃ)-এর সন্তান, অনুরূপ আরবের মুশরিকরা ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তান, কিন্তু তাদের আমল যেহেতু স্পষ্ট ভ্রষ্টতা বা শিরক ও অবাধ্যতার উপর ছিল, সেহেতু উক্ত উচ্চ বংশ-মর্যাদা তাদের আমলের পরিবর্ত হতে পারে না।

বায়তুল্লাহ নির্মাণ:

(কোন কোন বর্ণনায় বলা হয় যদিও কোন সহিহ বর্ননায় জানা যায় না যে-বায়তুল্লাহ প্রথমে ফেরেশতাগণ নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত আদম (আঃ) পুনর্নির্মাণ করেন জিব্রীলের ইঙ্গিত মতে। তারপর নূহের তূফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হ'লেও ভিত্তি আগের মতই থেকে যায়। যদিও সহিহ কোন রেফারেন্স পাওয়া যায় নাই।

আল্লাহর হুকুমে ইবরাহীম আ তা র্নির্মাণ করেন।)

এই নির্মাণকালে ইবরাহীম (আঃ) কেন'আন থেকে মক্কায় এসে বসবাস করেন। ঐ সময় মক্কায় বসতি গড়ে উঠেছিল এবং ইসমাঈল তখন বড় হয়েছেন এবং বাপ-বেটা মিলেই কা'বা গৃহ নির্মাণ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তখন থেকে অদ্যাবধি কা'বা গৃহে অবিরত ধারায় হজ্জ ও ত্বাওয়াফ চালু আছে এবং হরম ও তার অধিবাসীগণ পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সহকারে সেখানে বসবাস করে আসছেন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা সমূহ নিম্নরূপ:

আল্লাহ বলেন, (الحج -وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِيْ شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ-২৬)-

'আর যখন আমরা ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখো তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাতে দন্ডায়মানদের জন্য ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য' (হজ্জ ২২/২৬)। আল্লাহ বলেন,

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ- لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ- (الحج ২৭-২৮)-

'আর তুমি মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা জারি করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং (দীর্ঘ সফরের কারণে) সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ'তে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং (কুরবানীর) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে (১০, ১১, ১২ই যিলহাজ্জ) তাঁর দেওয়া চতুষ্পদ পশু সমূহ যবেহ করার সময় তাদের উপরে আল্লাহর নাম স্মরণ করে। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আহার করাও অভাবী ও দুস্থদেরকে' (হজ্জ ২২/২৭-২৮)।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। যেমন- (১) বায়তুল্লাহ ও তার সন্নিকটে কোনরূপ শিরক করা চলবে না (২) এটি স্রেফ তাওয়াফকারী ও আল্লাহর ইবাদতকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে (৩) এখানে কেবল মুমিন সম্প্রদায়কে হজ্জের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) মাক্বামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে এবং কোন কোন বর্ণনা মতে আবু কুবায়েস পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দুই কানে আঙ্গুল ভরে সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে চারদিকে ফিরে বারবার হজ্জের উক্ত ঘোষণা জারি করেন।

ইমাম বাগাভী হযরত ইবনু আববাসের সূত্রে বলেন যে, ইবরাহীমের উক্ত ঘোষণা আল্লাহ পাক সাথে সাথে বিশ্বের সকল প্রান্তে মানুষের কানে কানে পৌঁছে দেন। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, ইবরাহীমী আহবানের জওয়াবই হচ্ছে হাজীদের ‘লাববায়েক আল্লা-হুম্মা লাববায়েক’ (হাযির, হে প্রভু আমি হাযির) বলার আসল ভিত্তি। সেদিন থেকে এযাবত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হ’তে মানুষ চলেছে কা‘বার পথে কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ গাড়ীতে, কেউ বিমানে, কেউ জাহাযে ও কেউ অন্য পরিবহনে করে। আবরাহার মত অনেকে চেষ্টা করেও এ স্রোত কখনো ঠেকাতে পারেনি। পারবেও না কোনদিন ইনশাআল্লাহ। দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে সর্বদা চলছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সাঈ। আর হজ্জের পরে চলছে কুরবানী। এভাবে ইবরাহীম ও ইসমাঈলের স্মৃতি চির অম্লান হয়ে আছে মানব ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে। এক কালের চাষাবাদহীন বিজন পাহাড়ী উপত্যকা ইবরাহীমের দো‘আর বরকতে হয়ে উঠলো বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের সম্মিলন স্থল হিসাবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوْا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ- (البقرة ১২৫)-

‘যখন আমরা কা‘বা গৃহকে লোকদের জন্য সম্মিলনস্থল ও শান্তিধামে পরিণত করলাম (আর বললাম,) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানটিকে ছালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর। অতঃপর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই‘তেকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর’ (বাক্বারাহ ২/১২৫)।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ - (البقرة ১২৬)-

‘(স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলল, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তির নগরীতে পরিণত কর এবং এর অধিবাসীদেরকে তুমি ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর- যারা তাদের মধ্যে আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। (আল্লাহ) বললেন, যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরকেও কিছু ভোগের সুযোগ দেব। অতঃপর তাদেরকে আমি যবরদস্তি জাহান্নামের আযাবে ঠেলে দেব। কতই না মন্দ ঠিকানা সেটা’ (বাক্বারাহ ২/১২৬)।

ইবরাহীমের উপরোক্ত প্রার্থনা অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ- رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ- (إبراهيم ৩৫-৩৬)-

‘যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা! এ শহরকে তুমি শান্তিময় করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ’ (ইবরাহীম ৩৫)। ‘হে আমার পালনকর্তা! এরা (মূর্তিগুলো) অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্যতা করে, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ (ইবরাহীম ১৪/৩৬)।

অতঃপর কা‘বা গৃহ নির্মাণ শেষে পিতা-পুত্র মিলে যে প্রার্থনা করেন, তা যেমন ছিল অন্তরভেদী, তেমনি ছিল সুদূরপ্রসারী ফলদায়ক। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ- (البقرة ১২৭-১২৯)-

‘স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা‘বা গৃহের ভিত নির্মাণ করল এবং দো‘আ করল- ‘প্রভু হে! তুমি আমাদের (এই খিদমত) কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’। ‘হে প্রভু! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহে পরিণত কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য থেকেও তোমার প্রতি একটা অনুগত দল সৃষ্টি কর। তুমি আমাদেরকে হজ্জের নীতি-নিয়ম শিখিয়ে দাও এবং আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াবান’। ‘হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এদের মধ্য থেকেই এদের নিকটে একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদের নিকটে এসে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও দূরদৃষ্টিময়’ (বাক্বারাহ ২/১২৭-১২৯)।

ইবরাহীম ও ইসমাঈলের উপরোক্ত দো‘আ আল্লাহ কবুল করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে তাদের বংশে চিরকাল একদল মুত্তাকী পরহেযগার মানুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তাঁদের পরের সকল নবী তাঁদের বংশধর ছিলেন। কা‘বার খাদেম হিসাবেও চিরকাল তাদের বংশের একদল দ্বীনদার লোক সর্বদা নিয়োজিত ছিল। কা‘বার খেদমতের কারণেই তাদের সম্মান ও মর্যাদা সারা আরবে এমনকি আরবের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। আজও সঊদী বাদশাহদের লক্বব হ’ল ‘খাদেমুল হারামায়েন আশ-শারীফায়েন’ (দুই পবিত্র হরমের সেবক)। কেননা বাদশাহীতে নয়, হারামায়েন-এর সেবক হওয়াতেই গৌরব বেশী।

ইবরাহীমের দো‘আর ফসল হিসাবেই মক্কায় আগমন করেন বিশ্বনবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনি বলতেন, ‘ أَنَا دَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرَى عِيْسَى- আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দো‘আর ফসল ও ঈসার সুসংবাদ’। আহমাদ ও ছহীহ ইবনে হিব্বান, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫৪৫।

এই মহানগরীটি সেই ইবরাহীমী যুগ থেকেই নিরাপদ ও কল্যাণময় নগরী হিসাবে অদ্যাবধি তার মর্যাদা বজায় রেখেছে। জাহেলী আরবরাও সর্বদা একে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখত। এমনকি কোন হত্যাকারী এমনকি কোন পিতৃহন্তাও এখানে এসে আশ্রয় নিলে তারা তার প্রতিশোধ নিত না। হরমের সাথে সাথে এখানকার অধিবাসীরাও সর্বত্র সমাদৃত হ’তেন এবং আজও হয়ে থাকেন।

তাশাহহুদে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে কেন বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে?

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে মহান নেয়ামত ও সম্মানের জন্য মনোনীত করেছেন। কুরআনে তিনি একজন ইমাম (নেতা), একজন উম্মাহ (নিজের মধ্যে একটি জাতি), একজন হানিফ (একেশ্বরবাদী) এবং আল্লাহর প্রতি নিবেদিত, তিনি মহিমান্বিত ও মহিমান্বিত হন; তাঁর পরে আগত সকল নবী তাঁর বংশধর এবং সকল ধর্মের (মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদি) অনুসারীরা তাঁর প্রতি ঈমান আনে।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ইবরাহীম (আঃ) শ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বলেছেন যে, তিনি তাকে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। "আর আল্লাহ ইবরাহীমকে খলীলরূপে গ্রহণ করেছিলেন" (আন-নিসা ৪:১২৫)।

তাঁর পরে আগত সকল নবী ইসহাক ও ইয়াকুবের মাধ্যমে তাঁর বংশধর, মুহাম্মদ (সাঃ) ব্যতীত, যিনি ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীমের বংশধর।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য যে কারো চেয়ে ইবরাহীমের অধিক ঘনিষ্ঠ। সুতরাং ইবরাহীম (আঃ) বংশানুক্রমে আরবদের পিতা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বপুরুষ।

ইবরাহীম হলেন সেই ব্যক্তি, যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। "অতঃপর আমি আপনাকে (হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওহীম (আঃ) এর ধর্মের অনুসরণ কর, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না" (সূরা নাহল ১৬:১২৩)।

সুতরাং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং তাঁর অনুসারী হিসেবে আমরাও তাই।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের উপর সর্বোত্তম দাবীদার ছিল যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল, এই নবী (সাঃ) এবং যারা ঈমান এনেছে" (আলে 'ইমরান ৩:৬৮)। তিনি ইহুদী ও খৃষ্টানদের খণ্ডন করে বলেনঃ

"ইবরাহীম (আঃ) ইহুদী বা খ্রিষ্টান ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম হানিফা (ইসলামী একেশ্বরবাদী – তিনি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করতেন না) এবং তিনি মুশরিকুনভুক্ত ছিলেন না" (আলে 'ইমরান ৩:৬৭)।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: "কেন ইবরাহীম (আঃ) কে তাওহীদের আহ্বানের জন্য আলাদা করা হয়েছে, যেখানে সমস্ত নবী মানুষকে তাওহীদের (আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস) আহ্বান করেছিলেন?

তিনি উত্তর দিলেনঃ সকল নবী-রাসূল তাওহীদের পয়গাম নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"আপনার পূর্বে আমি কোন রাসূল প্রেরণ করিনি বরং তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছিলাম যে, 'লা ইলাহা ইল্লা আনা' (আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই), সুতরাং আমারই ইবাদত কর' (সূরা আম্বিয়া ২১:২৫)।

কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন আরবদের পিতা এবং বনী ইসরাঈলদের পিতা, এবং তিনি মানুষকে বিশুদ্ধ তাওহীদের দিকে আহ্বান করেছিলেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরা নিজেদের তাঁর অনুসারী বলে দাবী করলেও মুসলমানরা তাঁর অনুসারী। তিনি (সা.) নবীগণের পিতা নির্বাচিত হন। তিনি বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের প্রবর্তক এবং আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ আমরা ইবরাহীমের নিকটবর্তী, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:
"নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের উপর সর্বোত্তম দাবীদার ছিল যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল, এই নবী (সাঃ) এবং যারা ঈমান এনেছে" (আলে 'ইমরান ৩:৬৮)।
তিনি ইহুদী ও খৃষ্টানদের খণ্ডন করে বলেনঃ
"ইবরাহীম (আঃ) ইহুদী বা খ্রিষ্টান ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম হানিফা (ইসলামী একেশ্বরবাদী – তিনি একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করতেন না) এবং তিনি মুশরিকুনভুক্ত ছিলেন না" (আলে 'ইমরান ৩:৬৭)।
লিকাউল বাব আল-মাফতুহ, ১৮৯/প্রশ্ন নং ৭
আল-আল্লামা বদর আদ-দীন আল-'আইনী আল-হানাফী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন:

যদি বলা হয়, সালাতের সময় অন্য সকল নবীদের মধ্য থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নাম উল্লেখ করা হবে কেন?
আমি বলিঃ এটা এ কারণে যে, মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল নবী-রাসূলগণকে দেখেছেন এবং প্রত্যেক নবীকে সালাম দিয়ে সালাম দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কেউই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ছাড়া আর কেউ তাঁর উম্মতকে সালাম পাঠাননি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক নামাজ শেষে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তাঁর ওপর দরূদ পাঠ করতে।
আরো বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ) যখন কাবা ঘর নির্মাণ শেষ করেন, তখন তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য দোয়া করেন এবং বলেন: "হে আল্লাহ, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কাছ থেকে এই ঘরের হজ্জ করে, তাকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাও; আর তার পরিবার ও সন্তানরাও এই দোয়া করেছে, তাই তাদের সদয় কাজের প্রতি সাড়া দিয়ে নামাজে তাদের স্মরণ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শেষ উদ্ধৃতি। শরহে সুনান আবী দাউদ - আল-'আইনী (রাঃ) ৪/২৬০
আর আল্লাহই ভালো জানেন।

جزاكم الله خيرا